যা দেখি, যা শুনি, সেই থেকেই আমার কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে ঠাকুরদা পর্যন্ত আমি যেটুকু খবর রাখি কেউ কবিতা লিখতেন না। আমার বাবা ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র, সাহিত্যগত প্রাণ, কিন্তু নিজে কখনো লিখতেন না। আমার ঠাকুরমা, মা—এঁরাও কখনো নিজে লেখেননি। আমার এক কাকিমার আশ্চর্য সাহিত্যবোধ ছিল, যেটা আমার মায়েরও ছিল।

আমার জন্ম গ্রামের বাড়িতে। কলকাতায় একটা আস্তানা ছিল। বাবা পড়াতেন কলকাতার কলেজে। কলকাতায় বসবাসের জন্যে একটা বাসাবাড়ি দরকার। আমার বাবা-মা কলকাতায় চলে এলেন। আমার ভাইয়ের বয়স তখন দু-বছর। সেও চলে এল বাবা-মায়ের সঙ্গে। আমার আসা হলো না। আমার ঠাকুরদা আমার আসতে দিলেন না। তাঁর এক কথা—ও কলকাতায় যাবে কেন? ওর কলকাতায় যাবার কী দরকার!

মা খুব কান্নাকাটি করে মাঝে মাঝেই ঠাকুরমাকে চিঠি লিখতেন, এবার ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন। পুজোর আর গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবা-মা-ভাই গ্রামে আসতো। আমার কেমন যেন এদের বাইরের লোক মনে হতো। মা আবার চিঠি লিখলেন, ওর বয়স পাঁচ বছর হয়ে গেল, এবার ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন।

একটি দুপুর বেলা। বাইরের দৌড়ঝাঁপ সেরে ঘরে এসে শুয়ে আছি। জ্যৈষ্ঠ মাস, বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। আমার ঠাকুরদা-ঠাকুরমায়ের ভয় এই বোধহয় রোদে বার হয়ে পড়ি। আমি মটকা মেরে শুয়ে আছি। ঠাকুরমা আর ঠাকুরদাদা কথা বলছেন। আমি সব শুনতে পাচ্ছি। ঠাকুরমা বলছেন, বউমা তো আবার কান্নাকাটি করে চিঠি লিখেছেন।

ঠাকুরদা আলবোলায় তামাক টানছিলেন, বললেন, কান্নাকাটির কারণ কি?

খোকাকে কলকাতায় পাঠাতে বলছেন, কলকাতায় গেলে ওখানে কোনো একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে পারবে।

ঠাকুরদা তাতে বললেন, স্কুলে ভর্তি করা তো যেতেই পারে। ওর এখন বয়স ছয়। হাতে একটা পাটকাঠি থাকলে ও এখন মাটিতে আঁচড় কেটে অ আ ক খ লিখতে পারে। শুভঙ্করের আর্যা মুখস্থ বলতে পারে, সাঁতার কাটতে পারে, গাছে উঠতে পারে, হাতে একটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে বাজারে পাঠালে, বাজার থেকে যা যা বলা তেমন আনতে পারে, আবার বাকি পয়সাটা গুণে ফেরত দিতে পারে। কলকাতার কোন্ ইস্কুল ছ-বছরের ছেলেকে এর থেকে বেশি শেখাতে পারবে!

তাছাড়াও বলেছিলেন, ওর এখন ছ-বছর বয়স হয়নি, কোন্ সময়ে বীজ ছড়াতে হয় জানে। এখানে, পশ্চিমবঙ্গে যেমন বীজতলা করা হয়, পূর্ববঙ্গে বীজতলার ব্যাপারটাই নেই। বৃষ্টি হলে ক্ষেতে বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তারপর বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধানগাছ বাড়তে থাকে। ঠাকুরদা, বলে যাচ্ছেন, ছ-বছরের ছেলে কোন্ সময়ে বীজ ছড়াতে হয় জানে, কোন্ সময়ে ফসল তুলতে হয় জানে।

ফলে আমি গ্রামেই থেকে গেলাম।

আমার তখন বারো বছর মতো বয়স হবে।

একদিন খেলাধুলো সেরে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকছি। বললাম, রাত হলো ভাত দাও। আমার এক কাকিমা ছিলেন। ওঁদের বাড়িতে সাহিত্যচর্চা ছিল। ওঁর কাকা ছিলেন জরাসন্ধ, লেখক চারুচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি আমায় বললেন, তুই যে কবিদের মতো কথা বলছিস!

ওই একটা মাত্র পঙ্‌ক্তি, ওর মধ্যেই যে একটা অন্ত্যমিল কাজ করছে উনি ঠিক ধরে ফেলেছিলেন।

কলকাতায় এসে ভরতি হয়েছিলাম মিত্র ইন্সটিটিউশন-এ। বীজগণিতে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। পাটিগণিত সবটাই পারতাম। মিত্র ইন্সটিটিউশন-এ অ্যাডমিশন টেস্ট দেওয়ার পর আমি বলেই দিয়েছিলাম, আমার হবে না। যে বীজগণিতের সবকটা অঙ্ক ছেড়ে এসেছে তার হয় নাকি? আমার হয়নি।

পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার দেড় মাস পরে আমার ডাক পড়লো। কাকার সঙ্গে গিয়েছিলাম। হেডমাস্টার মশাই তাঁর ঘরে বসালেন। ঘড়ি চুরি নিয়ে একটা গল্প, সেটা অনুবাদ করতে দেওয়া হয়েছিল। অনুবাদে ছিল পঞ্চাশ নম্বর। চোর ধরা পড়লো, কারণ ঘড়ির পিছনের পাতে একটা নম্বর লেখা ছিল, সেটা ঘড়ি চোর বলতে পারেনি, মালিক বলে দিয়েছিল। তাতেই চোর ধরা পড়েছিল। সব ছেলেরা, যারা পরীক্ষায় বসেছিল তারা লিখেছিল A number was written...। আমার অনুবাদে ছিল A number was inscribed...। হেড মাস্টার মশাই বললেন, তিনি সব খাতাগুলোর উপর একবার চোখ বোলান, এইটুকু নিশ্চিত হতে যাতে কোনো ছেলের উপর অবিচার না হয়। সেইরকম দেখতে দেখতেই আমার খাতার উপর নজর পড়েছিল তাঁর। খাতা সবটাই ঠিক দেখা হয়েছিল। কিন্তু ওই শব্দটা written-এর জায়গায় inscribed লিখেছিলাম বলেই তাঁর মনে হয়েছিল আমাকে ভরতি করে নেওয়া উচিত। এই স্কুলেই আমি বাংলার শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম কবি কৃষ্ণদয়াল বসুকে।

শুনেছি, মিত্র ও ঘোষের যে বিখ্যাত আড্ডা ছিল, সেখানে তিনি একদিন বলেছিলেন, আমার এক ছাত্র ছিল নীরেন্দ্রনাথ, *দেশ* কবিতায় মাঝে মাঝেই এক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা দেখি, নাম দুটি তো একই।

আনন্দবাজার পত্রিকা-য় কাজ করার সময়, আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কবিশেখর কালিদাস রায়ের। তাঁর কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটা লেখা পেতাম। একবার একটি লেখায়, একটি বাক্যগঠনে আপত্তি তোলায়, তিনি বললেন, তুমি কোথায় পড়তে। আমি বললাম, আমি মিত্র ইন্সটিটিউশনেই পড়তাম, তবে আপনার মিত্র ইন্সটিটিউশন নয়। আমার বাংলার মাস্টারমশাই ছিলেন কৃষ্ণদয়াল বসু। তিনি বললেন, তুমি কৃষ্ণদয়ালের কাছে পড়েছো, তাহলে একটু-আধটু বাংলা জানো।

আমি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটা শিক্ষা নিয়েছি, কবে কোন্ কবিতা লিখছি, তার তলায় তারিখ লিখে রাখি। আমার সেদিনের কথা মনে আছে, আমি তখন ল কলেজে পড়ি। বি. এ. পাশ করেছি। শুনলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গুলি চলেছে। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে চলে গেলাম। সেখান থেকে বন্ধুদের সঙ্গে চলে গেলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। নিউ সিনেমার

সামনে দেখলাম চশমার ভাঙা ডাঁটি, ছেঁড়া চপ্পল, খাতা, বইপত্তর ছড়িয়ে আছে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল একটি ছাত্র। রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্ররা অবস্থানে অনড়। ঠিক তেমন বসে আছে, একটুও নড়েনি। বাড়িতে চলে এলাম। ফিরে এসেই লিখে ফেলেছিলাম সেই কবিতা, হে ঘোড়সওয়ার! আমার ভাই দেবদাস পাঠক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেই কবিতা *দেশ* পত্রিকায়। পরের সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল সেই কবিতা। পুরো পাতা জুড়ে, ফোর্টিন পয়েন্ট বোল্ড টাইপ।

লোকের মুখে মুখে ফিরেছে সেই কবিতা। হাতে হাতে নকল করে নিয়েছে সেই কবিতা। আমি দেখেছি, কেউ একজন সুর দিয়েছে, ছাত্ররা মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে গাইছে সেই কবিতা। তখনই আমি ভেবেছি, তাইতো আমার তো একটু সতর্ক হওয়ার আছে, কারণ কবিতা অন্য মানুষকে প্রভাবিত করে। অন্য অনেক মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে কবিতা।

চিত্ত বসু জন্মশতবর্ষে চিত্ত বসু স্মারক বক্তৃতা দেবার জন্য স্মারক কমিটির কর্তারা আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিষয় ছিল 'আন্দোলন ও কবিতা'। বক্তৃতা শেষ করে নামতে যাব, হঠাৎ খেয়াল করলাম পাঞ্জাবীর খুঁট ধরে টানছেন অশোক ঘোষ। বললেন, রামেশ্বরকে নিয়ে কবিতাটা পড়তে হবে। আপনার মনে না থাকতে পারে, আমার পুরোটা মনে আছে। অনেক কথা যা বলতে পারে, ওই একটি কবিতা এক লহমায় তা বলে দেবে।

পড়লাম সেই কবিতা।

মনে আছে একই রকম ভাবে গান্ধিজির মৃত্যুদিনেও লেখা হয়ে গিয়েছিল আমার কবিতা। রেডিয়োও তখন কথা গান বন্ধ করে, শুধু বেহালা বাজছিল। বোঝা গেল বড়ো একটা খবর আছে। সেটা খারাপ খবর। খানিক পরেই ঘোষণা করা হলো গান্ধিজির নিহত হওয়ার সংবাদ। আমরা একসঙ্গে রাস্তায় নামলাম, আমি, আমার স্ত্রী আর জ্যোৎস্নাময় দাস। নূর মহম্মদ লেনে দাঁড়িয়ে আছি, ওপারটায় দপ্তরি পাড়া। মানুষ নেমে এসেছে পথে। সন্ধে হচ্ছে। কেউ একজন রেডিয়ো খুলে রেখেছে। রেডিয়োয় নেহরুর গলা : এক পাগলা উনকো মার দিয়া। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ কেমন যেন মনে হলো। বুঝলাম আমার মধ্যে কবিতা এসেছে, আমি না লিখে পারবো না। আমি চলে এলাম ওখান থেকে।

পরদিন সকালে জ্যোৎস্নাময় বাড়ি এসে হাজির। বললে, কাল ওখান থেকে অমন করে চলে এলে, তার মানে কবিতা আছে। দাও।

আমি তার হাতে দিলাম সেই কবিতা। ত্রিদিব চৌধুরী তখন *গণবার্তা*-র সম্পাদক। ওঁদের কাগজে প্রকাশিত হলো সেই কবিতা।

আমার প্রথম কবিতার বই *নীল নির্জন* প্রকাশিত হয়েছিল *সিগনেট প্রেস* থেকে। তারও একটুখানি ইতিহাস আছে। কবিতা লিখে যাচ্ছি অনেকদিন ধরে। কিন্তু বই বার করবার জন্যে পাবলিশার কোথায় পাব? নিজের পয়সা খরচ করে বই ছাপানো যায়, কিন্তু আমি ওই ব্যবস্থায় রাজি না। একদিন কবি অরুণকুমার সরকার, আমার বন্ধু, আমায় এসে বললেন ডিকে তোর বই ছাপবে। দিলীপকুমার গুপ্ত মহাশয়ের *সিগনেট প্রেস* থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সেই কবিতার বই। সত্যজিৎ রায় প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন। আমি পরে জেনেছিলাম ঘটনাটা।

ডিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন অরুণকুমারকেই। ও ডিকেকে বলেছিল, আমার বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ, ও ভালো কবি, ওর কবিতার বই এখনো বার হয়নি। এটা অন্যায় হচ্ছে। আগে ওর কবিতার বই ছাপা হোক।

পরে অরুণ আমায় বলেছিল, এই যে আমার আগে তোর কবিতার বই ছাপা হলো, তার মানে এই নয় যে আমি তোমাকে আমার থেকে বড়ো কবি মনে করি। আসলে কবিতাটা আমার কাছে খেয়ালের ব্যাপার। কখনো একটা লিখলাম কি লিখলাম না। কিন্তু তোমার কাছে কবিতা তেমন নয়। Your very existence depends on it.

আমি বিশ্বাস করি, কল্পনা করার জন্যে একটা শক্তি দরকার। আমার সেই শক্তি নেই। আমি যা দেখি, যা শুনি, সেই থেকেই আমার কবিতা। আমার সব কবিতা এই দেখা থেকে জন্ম নিয়েছে। অবশ্য এমন হতেই পারে, যখন দেখলাম তখনই তা কবিতা হলো না, অনেককাল পরে সে কবিতা হয়ে ফিরে এল। আমার 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী', পঁচিশ বছর আগে দেখা দৃশ্য হঠাৎ কবিতা হয়ে উঠেছিল। আবার 'কলকাতার যীশু' যেদিন দেখেছি সেদিনই লিখে ফেলেছিলাম।

আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে বার হয়েছি। শ্যামবাজারের দিকে যাবো। পেট্রল পাম্পের উলটো দিকে এখন যেখানে এয়ার ইণ্ডিয়ার বাড়ি, সেখানে ড্রামের পর ড্রাম পড়ে রয়েছে। পাশেই এল. আই. সি-র বাড়িটা। ওই ড্রামের মধ্যে সংসার পাতিয়েছে মানুষ। অমন একটা ড্রাম থেকেই একটা বাচ্চা হঠাৎ বার হয়ে এসে রাস্তার এপার থেকে ওপারে ছুটে যাচ্ছে। তার আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তারপর রোদ্দুর।

আমার বড়ো মেয়ে তখন সবে হয়েছে। বাড়ি ফিরে দেখলাম আমার স্ত্রী তাকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। আলো জ্বালালাম না। আলো জ্বাললে ওদের ঘুম ভেঙে যাবে। অথচ কবিতাটা আমায় তখনই লিখে ফেলতে হবে। আমার স্ত্রীর সেলাই মেশিন থেকে কাঁচিটা বার করে নিলাম। বাইরে বার হলাম। বাইরের দেওয়ালে খুদে দিলাম কবিতাটা, যাতে পরদিন সকালে দেওয়াল থেকে কাগজে তুলতে পারি।